

পাইয়ে দেওয়ার জমি-নীতি বড় বিপদ ডেকে আনবে

স্বাধীন ভারতে যত জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই গরিব মানুষের স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়েছে। নতুন জমি অধিগ্রহণ বিলে সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে সরকার দানছত্র খুলেছে। লিখছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অমিতাভ গুপ্ত। শেষ পর্ব

জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এখন দেশ জুড়ে যে অশান্তি চলছে, সেটা আকাশ থেকে পড়েনি। তার জন্মও এই জমিতেই। এবং, সেই অসন্তোষের মূল কারণ, জমির দাম যা হওয়া উচিত, এত দিন সরকার তার ভগ্নাংশমাত্র দামে জমি অধিগ্রহণ করে এসেছে। স্বাধীনতার পরের ছ’দশকে দেশে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে— পাঁচ কোটি একরেরও বেশি। এই জমির প্রায় নব্বই শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রকল্পে— পরিকাঠামো তৈরি করতে, উন্নয়নের কাজে। সিংহ ভাগ জমি অধিগৃহীত হয়েছে হয় বাঁধ তৈরি করার জন্য, সেচের জন্য, বা পরিবহণ পরিকাঠামো তৈরির জন্য।

সেই উন্নয়নের মহাযজ্ঞে বলি হয়েছেন অনেক মানুষ— কমবেশি পাঁচ কোটি। আর, তাঁরা প্রায় সকলেই দরিদ্রতম শ্রেণির মানুষ— তাঁদের অধিকাংশই আদিবাসী, দলিত। তাঁরা তাঁদের জমির জন্য যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। তা-ও, যারা জমির মালিক, ক্ষতিপূরণ জুটেছিল শুধু তাঁদেরই। এই পাঁচ কোটির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। দুর্গাপুর, ডিভিসি, ফারাক্কা বাঁধ— সব মিলিয়ে, ওয়াশ্কার ফার্নান্ডেজ-এর হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন উদ্যোগের সংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ। এঁদের মাত্র ১০ শতাংশ পুনর্বাসন পেয়েছিলেন। দেশে সরকার যত জমি অধিগ্রহণ করেছিল, তার অনেকখানিই ছিল অরণ্য, পাহাড়, নদীর প্রাচীর ভূমি— অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে ‘কমন প্রপার্টি রিসোর্স’ বলা হয়। স্থানীয় মানুষদের এই ‘সম্পত্তি’ ভোগ করার অধিকার ছিল। উন্নয়নের যজ্ঞে সরকার এই অরণ্য, পাহাড়গুলিতে কেড়ে নেওয়ার মানুষের সেই অধিকার চলে গেল। যারা খাদ্যের জন্য, জ্বালানির জন্য নির্ভর করতেন অরণ্যের ওপর, নদীর ওপর— তাঁরা ক্ষতিপূরণের আওতার বাইরেই থেকে গেলেন। এই পাঁচ কোটি মানুষ স্বাধীন ভারতের ‘উন্নয়ন উদ্যম’।

হয়তো এ ভাবেই চলত, যদি না সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বোদাদ, পসকো, মহা মুন্সই— এই নামগুলো একের পর এক উঠে না আসত। একুশ শতকের প্রথম দশকের দ্বিতীয়াংশটি ভারতে জমি-অসন্তোষের যুগ। এবং, সেই অসন্তোষে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে— ১৮৯৪ সালের ওপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন দিয়ে আর একুশ শতকে জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না। নতুন আইন চাই— যে আইনে এত দিনের ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে।

ক্ষতিপূরণ, দানছত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রথম বার সেই চেষ্টা হল গত বছর— জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন-পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিল ২০১১ (এল এ আর আর ২০১১) তৈরি করার মাধ্যমে। এত দিন পর্যন্ত যে রাষ্ট্রীয় অন্যান্যগুলো চলছিল, তা শুধরে

নেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট। ঠিক হয়েছে, অধিগৃহীত জমির বাজারদর যত, গ্রামাঞ্চলে তার চার গুণ এবং শহরাঞ্চলে তার দ্বিগুণ দিতে হবে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে। পুনর্বাসন এবং জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাবদ প্রদেয় টাকা এর থেকে আলাদা। তার কতগুলো ভাগ রয়েছে— ১) পুনর্বাসনের খরচ হিসেবে এককালীন এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা; ২) পরিবারপিছু এক জনের চাকরি, অথবা এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা, অথবা কুড়ি বছর ধরে বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা (এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা আর কুড়ি বছর ধরে বাৎসরিক ২৪,০০০ টাকা হরদরে একই দাঁড়ায়); ৩) বিলে নির্দিষ্ট ন্যূনতম মান এবং সুযোগসুবিধাসহ বাড়ি, যার খরচ কমপক্ষে তিন লক্ষ টাকা (সেই বাড়ির জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং তার ক্ষতিপূরণের হিসেব ধরলে অঙ্কটা আরও অনেক বেশি); ৪) আদিবাসী এবং দলিতদের জন্য নির্দিষ্ট মানের পুনর্বাসন পল্লি। এই ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন শুধুমাত্র জমির মালিকদের জন্যই নয়, জমির ওপর যারা নির্ভরশীল, তাঁদের সবার জন্য।

ক্ষতিপূরণের, পুনর্বাসনের পরিমাণ দেখলে বোঝা যায়, এত দিনের অন্যান্য শুধরে নেওয়ার জন্য একটু বেশিই পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। একটু বেশি, নাকি অনেকখানি? এতটাই বেশি যে তাতে আটকে যেতে পারে শিল্পায়ন, উন্নয়নের কাজ? আমরা দেখাব, এই নতুন ব্যবস্থা আসলে আরও একটা ভুল। ঐতিহাসিক বঞ্চনাকে সংশোধন করতে গিয়ে সরকার ঐতিহাসিক দানছত্রের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এবং, তার প্রতিক্রিয়ায় ধাক্কা খাবেই শিল্পায়ন। তাতে সব রাজ্যেরই ক্ষতি; পশ্চিমবঙ্গ, কোরলা, বিহারের মতো রাজ্যের বেশি ক্ষতি।

প্রথমে জমির দামের প্রসঙ্গে আসা যাক। গ্রামাঞ্চলে জমির দাম কত, সেটা একেবারে নির্ভুল ভাবে জানা কঠিন। সেখানে জমি কেনা-বেচা কম হয়, আদিবাসীদের জমির ক্ষেত্রে কোনো-বেচার ওপর অনেকগুলি বাধানিষেধও আছে। তার ওপর, জমির দাম আসলে যত, নথিপত্রের তার চেয়ে কম উল্লেখ করার প্রবণতাও প্রায় সর্বজনীন। তবু, একটা গড়পড়তা হিসেবে বলা যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত অনুর্বর গ্রামীণ জমির দাম একরপ্রতি চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। আর, জমি উর্বর হলে— এবং ঘটনাক্রমে এই রাজ্যের অধিকাংশ উর্বর জমিই কলকাতার অপেক্ষাকৃত কাছে— সে জমির দাম একরপ্রতি ১০ লক্ষ টাকা। নতুন ক্ষতিপূরণের নিয়ম মানলে, আনুমানিক ভাবে, এক একর জমির দাম হবে ১৬ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা।

পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার চারটি অংশের খরচ যোগ করলে দেখা যাচ্ছে, যারা জমি হারাবেন, এবং যারা জীবিকা হারাবেন, তাঁদের পরিবারপিছু পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার খরচ হবে কম-বেশি নয় লক্ষ টাকা। একরপ্রতি পুনর্বাসনের খরচ কম দাঁড়াবে, তা নির্ভর করছে জোতের মাপ এবং জমির মালিক নন কিন্তু

জীবিকার জন্য জমির ওপর নির্ভরশীল, এমন মানুষের সংখ্যার ওপর। জোতের মাপ যত ছোট হবে, আর যত বেশি মানুষ জীবিকার জন্য জমির ওপর নির্ভরশীল হবেন, পুনর্বাসনের খরচ তত বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জোতের ৮১.২ শতাংশই প্রান্তিক জোট, গড়ে একটি জোতের মাপ ১.৯৫ একর। বর্ধমান জেলার কথাই ধরা যাক। এখানে একটি জোতের গড় মাপ ২.৪৭ একর। এক জন জমির মালিকপিছু জমির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা গড়ে ২.০৪ জন। সামান্য গুণ-ভাগের অঙ্ক করলেই দেখা যাবে, বর্ধমান জেলায় প্রতি একর জমির ওপর নির্ভরশীল মোট মানুষের সংখ্যা ১.২৩



চার বছর আগে। সিঙ্গুরের টাটা মোটর-এর কারখানা তৈরির কাজ চলছে। জানুয়ারি ২০০৮

জন। অর্থাৎ, পুনর্বাসনের জন্য মাথাপিছু নয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন হলে বর্ধমানে এক একর জমিতে পুনর্বাসনের খরচ ১১.১ লক্ষ টাকা। যেহেতু বর্ধমানে জোতের মাপ অপেক্ষাকৃত বড়, তাই এই খরচটা তুলনামূলক ভাবে কম। হুগলিতে জোত ছোট, গড়ে ১.৫৫ একর। এই জেলায় পুনর্বাসনের খরচ দাঁড়াবে প্রতি একরে ১৫ লক্ষ টাকা।

এ বার সিঙ্গুরের জমির কথা ভাবুন। সেখানে ৯৯৭ একর জমিতে মালিকের সংখ্যা ৫,০০০ জন, নির্ভরশীল আরও কমপক্ষে ১,০০০ মানুষ। হিসেব করলে দেখা যাবে, সেখানে এক একর জমির জন্য পুনর্বাসনের খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে বাজারদরের চার গুণ জমির দাম যোগ করুন— এক একর জমি অধিগ্রহণের খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। এই দামে জমি বেচতে চাওয়ার

আজ দ্বিগুণ দামে কিছু জমি বিক্রি হলে পার্শ্ববর্তী জমির দাম বাড়বে। পরে সেই জমি কেনার প্রয়োজন পড়লে এই বর্ধিত দামের দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে। প্রতি দফায় এই ভাবে খরচ বাড়তে থাকলে শহরের দামের দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে।

জন্য ‘কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান’ মার্কা ছড়োছড়ি না পড়াটাই আশ্চর্যের হবে।

উন্নয়নের গতিভঙ্গ

প্রশ্ন হল, গ্রামের মানুষ যদি জমির জন্য চড়া দাম পান, তাতে আমরা আপত্তি করব কেন? শিল্পায়নের সুফল তাঁদের কাছে তো এই রাস্তা ধরেই পৌঁছবে। আপত্তিটাই আপত্তিকর মনে হতে পারে। ভেঙে দেখা যাক। জোতের মাপ ছোট হলে, জমির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বেশি হলে সে জমি অধিগ্রহণের খরচও বেশি হয়। দেশের সব রাজ্যে জোতের মাপ

এক দিকে টাকা নেই, অন্য দিকে জোতের মাপ ছোট ফলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেশি। জমিহারা, জীবিকাহারা মানুষদের বেশি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টায় উন্নয়নের সম্পূর্ণ গতিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা খুব স্পষ্ট।

একটা কথা মনে হচ্ছে। এল এ আর আর ২০১১-য় সরকার এক ধরনের অধিগ্রহণের কথাই ভেবেছে— প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ করে ইম্পাত কারখানার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানা গড়ে তোলা হবে। এই ধরনের শিল্পে মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রচুর, ফলে জমির চড়া দাম প্রাথমিক ভাবে বহন করা সম্ভব। কিন্তু, এই চিন্তায় দুটো ভ্রান্তি আছে। এক, দ্বাদশ পরিকল্পনায় সরকার দেশের পরিকাঠামো খাতে মোট এক লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করবে বলে স্থির করেছে। এই বিপুল অর্থ যদি সবাই বিায় করা হয়, তবে যে প্রকল্পগুলো চালু হবে, তার জন্য অনেক জমি প্রয়োজন। অর্থাৎ, আগামী পাঁচ বছরে সরকারই দেশের সবচেয়ে বড় জমির খন্দের হতে চলেছে। এর সঙ্গে মনে রাখা ভাল, জমি কেনা-বেচা আরম্ভ হলে বাজার দরও চড়বে, ফলে জমি অধিগ্রহণের খরচ ক্রমেই বাড়বে। সরকার তৈরি তো? নাকি, এই বিপুল দামের চোটে পরিকাঠামোর উন্নয়ন পরিকল্পনাতেই থেকে যাবে? দ্বিতীয় ভ্রান্তি হল, বেশির ভাগ বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রত্যন্ত গ্রামে জমি কিনে স্বয়ংসম্পূর্ণ কারখানা তৈরি করাটা কোনও সম্ভাব্য বিকল্প নয়। কেন, তা গত পর্বে আলোচনা করেছি। বেশির ভাগ শিল্পই শহরের কাছে জমি চাইবে। আর, সেই জমির দাম সিঙ্গুরের জমির মতোই— সাধারণ বাইরে।

গ্রামের জমির সঙ্গে শহরের বা তার উপকণ্ঠের জমির একটা মস্ত ফারাক— গত দশ বছরে শহরের জমির দাম ছুঁ করে বেড়েছে। ফলে, এই এলাকায় জমির দাম এখন কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে। নতুন আইন অনুযায়ী যদি সেই বাজারচলতি দরেরও দ্বিগুণ দামে জমি কিনতে হবে, খরচের পরিমাণ কল্পনাভীত হবে। এখানে দুটো কথা বলা প্রয়োজন। এক, শহরের জমির দাম বাড়ার পিছনে সরকারের অবদান আছে। এলাকায় পরিকাঠামোর যত উন্নতি হয়েছে, বড় রাস্তা তৈরি হয়েছে, বিদ্যুৎ এসেছে— জমির দাম ততই বেড়েছে। এক ভাবে দেখলে, অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে বাড়তি দাম দেওয়ার কথা, সরকার ইতিমধ্যেই সেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। সেখানে ফের দ্বিগুণ দাম দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবতে হবে। দুই, আজ দ্বিগুণ দামে কিছু জমি বিক্রি হলে সেই টানেই পার্শ্ববর্তী জমির দাম বাড়বে। পরে যখন সেই জমি কেনার প্রয়োজন পড়বে, তখন এই বর্ধিত দামের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা দিতে হবে। প্রতি দফায় এই ভাবে খরচ বাড়তে থাকলে শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে শিল্প তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই না।

এখনও সময় আছে। সরকারকে ভেবে দেখতে হবে, জমিহারা মানুষের স্বার্থ, আর সার্বিক শিল্পায়ন— দুটোকেই রক্ষা করার রাস্তা কী। রাস্তা আছে। কিন্তু, সেই রাস্তার সন্ধানে সং ভাবে চলা প্রয়োজন। জমি যত দিন মূলত রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে থাকবে, এই সততার আশা করা কঠিন।

(শেষ)

শ্রীচক্রবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে ভূগোল ও নগরবিদ্যার শিক্ষক